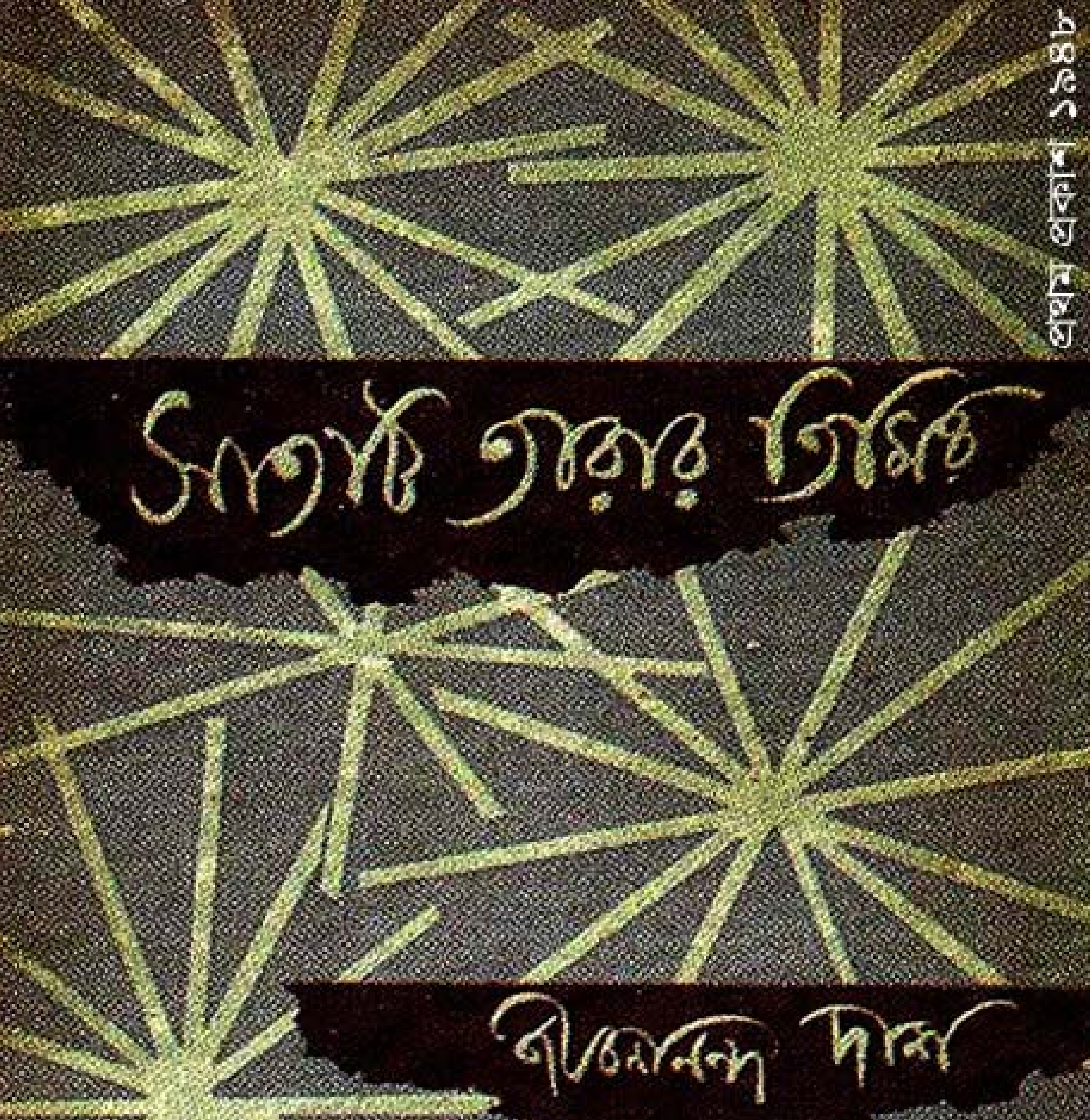
সাতটি তারার তিমির
জীবনানন্দ দাশ
প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮

সাতটি তারার তিমির

জীবনানন্দ দাশ

রচনাকাল ১৯২৮—১৯৪৩   প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮

সাতটি তারার তিমির জীবনানন্দ দাশের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে, বাংলা অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ সনে। প্রকাশক আতাওয়ার রহমান, কলকাতার 'গুপ্ত রহমান এন্ড গুপ্ত' প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করেন সাতটি তারার তিমির। প্রচ্ছদ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। ৪০টি কবিতা নিয়ে ৬+৮০ পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের বইটির মূল্য রাখা হয়েছিল আড়াই টাকা। বইটি জীবনানন্দ দাশ উৎসর্গ করেন হুমায়ুন কবিরকে।

হুমায়ুন কবির ফরিদপুরের লোক, কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে তিনি ভারতে থেকে যান, যদিও ফরিদপুর পাকিস্তানে অংশ হয়। জীবনানন্দ এসময় চাকরি খুঁজছিলেন আর হুমায়ুন কবির ছিলেন কংগ্রেস সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অধীনে ভারতের যুগ্ম শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান।

'সাতটি তারার তিমির' প্রকাশিত হবার পরে জীবনানন্দ দাশ 'স্বরাজ' নামে এক দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'স্বরাজ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুমায়ুন কবির।

এবারে প্রকাশিত হলো জীবনানন্দ দাশ রচিত 'সাতটি তারার তিমির'—এর আর্টস সংস্করণ। সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ দিয়ে বর্তমান আর্টস সংস্করণের প্রচ্ছদ করা হয়েছে।

সূচীপত্র

১। আকাশলীনা

২। ঘোড়া

৩। সমারূঢ়

৪। নিরঙ্কুশ

৫। রিস্টওয়াচ

৬। গোধূলিসন্ধির নৃত্য

৭। যেইসব শেয়ালেরা

৮। সপ্তক

৯। একটি কবিতা

১০। অভিভাবিকা

১১। কবিতা

১২। মনোসরণি

১৩। নাবিক

১৪। রাত্রি

১৫। লঘু মুহূর্ত

১৬। হাঁস

১৭। উন্মেষ

১৮। চক্ষুস্থির

১৯। ক্ষেতে—প্রান্তরে

২০। বিভিন্ন কোরাস

২১। স্বভাব

২২। প্রতীতি

২৩। ভাষিত

২৪। সৃষ্টির তীরে

২৫। জুহু

২৬। সোনালি সিংহের গল্প

২৭। অনুসূর্যের গান

২৮। তিমিরহননের গান

২৯। বিস্ময়

৩০। সৌরকরোজ্জ্বল

৩১। সূর্যতামসী

৩২। রাত্রির কোরাস

৩৩। নাবিকী

৩৪। সময়ের কাছে

৩৫। লোকসামান্য

৩৬। জনান্তিকে

৩৭। মকরসংক্রান্তির রাতে

৩৮। উত্তরপ্রবেশ

৩৯। দীপ্তি

৪০। সূর্যপ্রতিম

সাতটি তারার তিমির' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র। কলকাতা ১৯৪৮

রচনাকাল ১৩৩৫-১৩৫০

প্রথম সংস্করণ

অগ্রহায়ণ ১৩৫৫

মূল্য ২॥০ টাকা

প্রকাশক : আতাওয়ার রহমান

পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা

মুদ্রাকর : প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

'সাতটি তারার তিমির' প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ-বিবরণপত্র। কলকাতা ১৯৪৮

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা অই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা:
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরও দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে?—তার সাথে!
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ:
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস:
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৪৪

ঘোড়া

আমরা যাইনি মরে আজও—তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়:
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর ’পরে।

আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে একভিড় রাত্রির হাওয়ায়;
বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে;
চায়ের পেয়ালা ক’টা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে

হিম হয়ে নড়ে গেল ও—পাশের পাইস্—রেস্তরাঁতে,
প্যারাফিন—লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে।
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ—স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

চতুরঙ্গ। আষাঢ় ১৩৪৭

সমারূঢ়

‘বরং নিজেই তুমি লেখনাকো একটি কবিতা—’
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা:
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের ’পর
বসে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক,—দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিল—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি।

কবিতা৷ আশ্বিন ১৩৪৪

নিরঙ্কুশ

মালয় সমুদ্রপারে সে এক বন্দর আছে শ্বেতাঙ্গিনীদের।
যদিও সমুদ্র আমি পৃথিবীতে দেখে গেছি ঢের:
নীলাভ জলের রোদে কুয়ালালুম্পুর, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি
অনেক ঘুরেছি আমি—তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

শাদা—শাদা ছোটো ঘর নারকেলক্ষেতের ভিতরে
দিনের বেলায় আরও গাঢ় শাদা জোনাকির মতো ঝরঝরে।
শ্বেতাঙ্গদম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো
সময় পোহায়ে যায়; মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত,
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

বাণিজ্যবায়ুর গল্পে একদিন শতাব্দীর শেষে
অভ্যুত্থান শুরু হল এইখানে নীলসমুদ্রের কটিদেশে;
বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন,
চারিদিকে পামগাছ—ঘোলা মদ—বেশ্যালয়—সেঁকো—কেরোসিন
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।

সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়—উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস;
নারকেলকুঞ্জবনে শাদা—শাদা ঘরগুলো ঠাণ্ডা করে রাখে;
লাল কাঁকরের পথ—রক্তিম গির্জার মুণ্ড দেখা যায় সবুজের ফাঁকে:
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় লীন।

নিরুক্ত। আশ্বিন ১৩৪৮

রিস্টওয়াচ

কামানের ক্ষোভে চূর্ণ হয়ে
আজ রাতে ঢের মেঘ হিম হয়ে আছে দিকে—দিকে।
পাহাড়ের নিচে—তাহাদের কারু—কারু মণিবন্ধে ঘড়ি
সময়ের কাঁটা হয়তো বা ধীরে—ধীরে ঘুরাতেছে;
চাঁদের আলোর নিচে এই সব অদ্ভুত প্রহরী
কিছুক্ষণ কথা কবে;—
হৃদয়যন্ত্রের যেন প্রীত আকাঙ্ক্ষার মতো নড়ে,
সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো গিলে।
জলপাইপল্লবের তলে ঝরা বিন্দু—বিন্দু শিশিরের রাশি
দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো—জনহীন—বাতাসের ধ্বনি
দু—এক মুহূর্ত আরও ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত—স্তিমিত আরও করে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।

কবিতা। পৌষ ১৩৪৫

গোধূলিসন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে
যেইখানে পড়ে আছে—শব্দহীন—ভাঙ্গা—
সেইখানে উঁচু—উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল—রাঙা—

চুপে—চুপে ডুবে যায়—জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দেখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরীতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;
নৃমুণ্ডের আবছায়া—নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ—মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো;
পুরুষ তাদের: কৃতকর্ম নবীন;
খোঁপার ভিতরে চুলে: নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী;—দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই;—এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে—বরুণে

ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে—জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হয়ে গেছে সব;—বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

পরিচয়। চৈত্র ১৩৪৫

যেইসব শেয়ালেরা

যেইসব শেয়ালেরা—জন্ম—জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে—বার হয়—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে;—উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেইসব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মতো আত্মায়:
তাহলে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিত;—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

পরিচয়। চৈত্র ১৩৪৫

সপ্তক

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,—জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হয়েছে শোয়া;—তারপর একদিন চলে গেছে কোন্ দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হলে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে:
সরোজিনী চলে গেল অতদূর? সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের মতো পাখা বিনা?
হয়তো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ? জ্যামিতির ভূত বলে: আমি তো জানি না।
জাফরান—আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে:
লুপ্ত বেড়ালের মতো; শূন্য চাতুরির মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

পরিচয়। চৈত্র ১৩৪৫

একটি কবিতা

পৃথিবী প্রবীণ আরও হয়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে;
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।
ও প্রাসাদে কারা থাকে?—কেউ নেই—সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে
নড়িতেছে—জ্বলিতেছে—মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে আগুন জ্বলে যায়—দহেনাকো কিছু।
সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায়
সে আগুন জ্বলে যায়—দহেনাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ঐ আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যার নদীর জলে একভিড় হাঁস অই—একা;
এখানে পেল না কিছু; করুণ পাখায়
তাই তারা চলে যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হল মুখ দেখা।

২

রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়—আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারও নৌকার বাতি জ্বলে;
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে;
সব কেরোসিন—অগ্নি মরে গেছে; জলের ভিতরে আভা দহে যায়

মায়াবীর মতো জাদুবলে।
পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে
ঢের দূর ভূমিকার ’পর;
সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের ’পরে ছুটে সারাদিন
হয়ে গেছে এখন পাথর;
যে সব যুবারা সিংহীগর্ভে জন্মে পেয়েছিল কৌটিল্যের সংযম
তারাও মরেছে—আপামর।
যেন সব নিশিডাকে চলে গেছে নগরীকে শূন্য করে দিয়ে—
সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে;
গভীর নিসর্গ সাড়া দিয়ে শ্রুতি—বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে দিত তবু
একটি মানুষ কাছে পেলে;
যে মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যে দীপ প্যারাফিন,
বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে,
সম্রাটের সৈনিকেরা যে সব লাবণি, লবণরাশি খাবে জেগে উঠে,
অমায়িক কুটুম্বিনী জানে;
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালিকে
আঘাত করিবে কোন্‌খানে?
হয়তো নিসর্গ এসে একদিন বলে দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে
জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে।

অভিভাবিকা

তবুও যখন মৃত্যু হবে উপস্থিত
আর—একটি প্রভাতের হয়তো বা অন্যতর বিস্তীর্ণতায়,—
মনে হবে
অনেক প্রতীক্ষা মোরা করে গেছি পৃথিবীতে
চোয়ালের মাংস ক্রমে ক্ষীণ করে
কোনো এক বিশীর্ণ কাকের অক্ষিগোলকের সাথে
আঁখি—তারকার সব সমাহার এক দেখে;
তবু লঘু হাস্যে—সন্তানের জন্ম দিয়ে—
তারা আমাদের মতো হবে—সেই কথা জেনে—ভুলে গিয়ে—
লোল হাস্যে জলের তরঙ্গ মোরা শুনে গেছি আমাদের প্রাণের ভিতর,
নব শিকড়ের স্বাদ অনুভব করে গেছি—ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে।
অনেক গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল
বহুবিধ জন্তুর কপাল
উন্মোচিত হয়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে থাকে পথ—পথান্তরে;
তবু ঐ নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয়;
হাতে তার তুলাদণ্ড;
শান্ত—স্থির;
মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।
যেন তার কাছে জীবনের অভ্যুদয়
মধ্য—সমুদ্রের ’পরে অনুকূল বাতাসের প্ররোচনাময়
কোনো এক ক্রীড়া—ক্রীড়া,
বেরিলমণির মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু।
স্থির—শুভ্র—নৈসর্গিক কথা বলিবার অবসর।

নতুন পত্র। আশ্বিন ১৩৪৬

কবিতা

আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে জেনে
পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছে ভেসে;
তা না হলে সকলই হারায়ে যেত ক্ষমাহীন রক্তে—নিরুদ্দেশে।
হে আকাশ, একদিন ছিলে তুমি প্রভাতের তটিনীর;
তারপর হয়ে গেছ দূর মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের।
ভোরবেলা পাখিদের গানে তাই ভ্রান্তি নেই,
নেই কোনো নিষ্ফলতা আলোকের পতঙ্গের প্রাণে।
বানরী ছাগল নিয়ে যে ভিক্ষুক প্রতারিত রাজপথে ফেরে—
আঁজলায় স্থির শান্ত সলিলের অন্ধকারে—
খুঁজে পায় জিজ্ঞাসার মানে।
চামচিকা বার হয় নিরালোকে ওপারের বায়ুসন্তরণে;
প্রান্তরের অমরতা জেগে ওঠে একরাশ প্রাদেশিক ঘাসের উন্মেষে;
জীর্ণতম সমাধির ভাঙ্গা ইঁট অসম্ভব পরগাছা ঘেঁষে
সবুজ সোনালিচোখ ঝিঁঝিঁ—দম্পতির ক্ষুধা করে আবিষ্কার।
একটি বাদুড় দূর স্বোপার্জিত জ্যোৎস্নার মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়
যাহাদের যতদূর চক্রবাল আছে লভিবার।
হে আকাশ, হে আকাশ,
একদিন ছিলে তুনি মেরুনিশীথের স্তব্ধ সমুদ্রের মতো;
তারপর হয়ে গেছ প্রভাতের নদীটির মতো প্রতিভার।

মনোসরণি

মনে হয় সমাবৃত হয়ে আছি কোন্ এক অন্ধকার ঘরে—
দেয়ালের কার্নিশে মক্ষিকারা স্থিরভাবে জানে:
এইসব মানুষেরা নিশ্চয়তা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে;
পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোসে।

হয়তো চেঙ্গিস আজও বাহিরে ঘুরিতে আছে করুণ রক্তের অভিযানে।
বহু উপদেশ দিয়ে চলে গেলে কনফুসিয়াস—
লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইঁট সব করে ফেলে ফাঁস।
বাতাসে ধর্মের কল নড়ে ওঠে— নড়ে চলে ধীরে।
সূর্যসাগরতীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে
কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হল রক্তে—উপেক্ষায়;
বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আজও আসে।
সূর্যের সোনালি রশ্মি, বোলতার স্ফটিক পাখনা,
মরুভূর দেশে যেই তৃণগুচ্ছ বালির ভিতরে
আমাদের তামাসার প্রগল্ভতা হেঁট শিরে মেনে নিয়ে চুপে
তবু দুই দণ্ড এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে,
যে সারস—দম্পতির চোখে তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতো নদী এসে
ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বে—হয়তো বা
ফেলেছিল সৃষ্টির আগাগোড়া শপথ হারিয়ে
যে বাতাস সারাদিন খেলা করে অরণ্যের রঙে,

যে বনানী সুর পায়—

আর যারা মানবিক ভিত্তি গড়ে—ভেঙে গেল বার—বার—
হয়তো বা প্রতিভার প্রকম্পনে—ভুল করে—বধ করে—প্রেমে;—
সূর্যের স্ফটিক আলো স্তিমিত হবার আগে সৃষ্টির পারে
সেইসব বীজ আজও জন্ম পায় মৃত্তিকা অঙ্গারে।
পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন
সেইসব আদি অ্যামিবারা আজ পরিহাসে হয়েছে বিলীন।
সূর্যসাগরতীরে তবুও জননী বলে সন্ততিরা চিনে নেবে কারে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৪৬

নাবিক

কোথাও তরণী আজ চলে গেছে আকাশরেখায়—তবে—এই কথা ভেবে
নিদ্রায় আসক্ত হতে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক;
সূর্য যেন পরম্পরাক্রম আরও—অই দিকে—সৈকতের পিছে
বন্দরের কোলাহল—পাম সারি—তবু তার পরে স্বাভাবিক

স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে;
গোধূম—ক্ষেতের ভিড়ে সাধারণ কৃষকের খেলার বিষয়;
তবু তার পরে কোনো অন্ধকার ঘর থেকে অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়
বল্লমের মতো দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয়—

আশ্চর্য সোনার দিকে চেয়ে থাকে; নিরন্তর দ্রুত উন্মীলনে
জীবাণুরা উড়ে যায়—চেয়ে দেখে—কোনো এক বিস্ময়ের দেশে।
হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য করে শুধু?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে

অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চলে যাও—দুপুর বেলায়;
বৈশালীর থেকে বায়ু—গেৎসিমানি—আলেক্জান্দ্রিয়ার
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পেছনে পড়ে অমায়িক সংকেতের মতো;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরও দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার

প্রায়োজন রয়ে গেছে—যতদিন স্ফটিক—পাখনা মেলে বোলতার ভিড়

উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে; এরোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
নীলিমাকে খুলে ফেলে যতদিন; ভুলের বুনুনি থেকে আপনাকে মানবহৃদয়:
উজ্জ্বল সময়—ঘড়ি—নাবিক—অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।

পরিচয়। ফাল্গুন ১৩৪৬

রাত্রি

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে—সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল—মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিক্ স্ট্রিটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে;
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে;
রাজ্য জয় করে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চলে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার করে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

কবিতা। পৌষ ১৩৪৭

লঘু মুহূর্ত

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরীর
অত্যন্ত প্রশান্ত হল মন;
ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল—রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিল মুখ আচমন।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে রাঙা নদী বলে:
সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে যাদুবলে।

তবুও যাবার আগে তিনটি ভিখিরী মিলে গিয়ে
গোল হয়ে বসে গেল তিন মগ চায়ে;
একটি উজির, রাজা, বাকিটা কোটাল,
পরস্পরকে তারা নিল বাৎলায়ে।
তবুও এক ভিখিরিনী তিনজন খোঁড়া, খুড়ো, বেয়াইয়ের টানে—
অথবা চায়ের মগে কুটুম হয়েছে এই জ্ঞানে
মিলেমিশে গেল তারা চার জোড়া কানে।

হাইড্র্যান্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতরে
জীবনকে আরও স্থির, সাধুভাবে তারা
ব্যবহার করে নিতে গেল সোঁদা ফুটপাতে বসে;
মাথা নেড়ে দুঃখ করে বলে গেল: 'জলিফলি ছাড়া
চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ
এমন কী হত জাঁহাবাজ?
ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর—ভাদ্রবৌ সকলে নারাজ।'

বলে তারা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব করে নিল এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাঁকচুন্নিকে।
এ মেয়েটি হাঁস ছিল একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার করে দিল তাকে আরেক গেলাস:
‘আমাদের সোনা—রুপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস?’

এ সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ;
লাফায়ে—লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায়;
নদীর জলের পারে বসে যেন, বেন্টিক্ স্ট্রিটে
তাহারা গণনা করে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায়;
চুলের এঁটিলি মেরে গুনে গেল অন্যায়—ন্যায়;
কোথায় ব্যয়িত হয়—কারা করে ব্যয়;
কী—কী দেয়া—থোয়া হয়—কারা কাকে দেয়;

কী করে ধর্মের কল নড়ে যায় মিহিন বাতাসে;
মানুষটা মরে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়—বিনি দামে—তবে কার লাভ—
এই নিয়ে চারজনে করে গেল ভীষণ সালিশি।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে;
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দেখে—যতদিন মুখ দেখা চলে।

নিরুক্ত। পৌষ ১৩৪৮

হাঁস

নয়টি হাঁসকে রোজ চোখ মেলে ভোরে
দেখা যায় জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে;
তিনবার তিন গুনে নয় হয় পৃথিবীর পথে;
এরা তবু নয়জন মায়াবীর মতো জাদুবলে।

সে নদীর জল খুব গভীর—গভীর;
সেইখানে শাদা মেঘ—লঘু মেঘ এসে
দিনমানে আরও নিচে ডুবে গিয়ে তবু
যেতে পারেনাকো কোনো সময়ের শেষে।

চারিদিকে উঁচু—উঁচু উলুবন, ঘাসের বিছানা;
অনেক সময় ধরে চুপ থেকে হেমন্তের জল
প্রতিপন্ন হয়ে গেছে যে সময়ে নীলাকাশ বলে
সুদূরে নারীর কোলে তখন হাঁসের দলবল

মিশে গেছে অপরাহ্নে রোদের ঝিলিকে;
অথবা ঝাঁপির থেকে অমেয় খইয়ের রঙ ঝরে;
সহসা নদীর মতো প্রতিভাত হয়ে যায় সব;
নয়টি অমল হাঁস নদীতে রয়েছে মনে পড়ে।

নিরুক্ত। পৌষ ১৩৪৮

উন্মেষ

কোথাও নদীর পারে সময়ের বুকে—
দাঁড়ায়ে রয়েছে আজও সাবেককালের এক স্তিমিত প্রাসাদ;
দেয়ালে একটি ছবি: বিচারসাপেক্ষভাবে নৃসিংহ উঠেছে;
কোথাও মঙ্গল সংঘটন হয়ে যাবে অচিরাৎ।

নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে
অনেক মলিন যুগ—অনেক রক্তাক্ত যুগ সমুত্তীর্ণ করে,
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে
আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে।

স্বাক্ষরের অক্ষরের অমেয় স্তূপের নিচে বসে থেকে যুগ
কোথাও সংগতি তবু পায়নাকো তার;
ভারে কাটে—তথাপিও ধারে কাটে বলে
সমস্ত সমস্যা কেটে দেয় তরবার।

    চোখের উপরে
            রাত্রি ঝরে;
যে দিকে তাকাই
            কিছু নাই
            রাত্রি ছাড়া;
অন্ধকার সমুদ্রের তিমির মতন

উদীচীর দিকে ভেসে যাই;
হনলুলু সাগরের জল,
ম্যানিলা—হাওয়াই,
টাহিটির দ্বীপ,
কাছে এসে দূরে চলে যায়—
দূরতর দেশে।
কী এক অশেষ কাজ করেছিল তিমি;
সিন্ধুর রাত্রির জল এসে
মৃদু মর্মরিত জলে মিশে গিয়ে তাকে
বোর্নিওর সাগরের শেষে—
যেখানে বোর্নিও নেই—ম্লান আলাস্কাকে
ডাকে।
যতদূর যেতে হয়
ততদূর অবাচীর অন্ধকারে গিয়ে
তিমির—শিকারি এক নাবিককে আমি
ফেলেছি হারিয়ে;
তিমির—পিপাসী এক রমণীকে আমি
হারায়ে ফেলেছি;
কোথায় রয়েছি—
জীব হয়ে কবে
ভূমিষ্ঠ হয়েছি।
এই তো জীবন:

সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে;

নিপট আঁধার;

ভালো বুঝে পুনরায়

সাগরের সৎ অন্ধকারে নিষ্ক্রমণ।

সবই আজও প্রতিশ্রুতি, তাই

দোষ হয়ে সব

হয়ে গেছে গুণ।

বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের

রাত্রির বেবুন।

নিরুক্ত। পৌষ ১৩৪৮

চক্ষুস্থির

ক্লান্ত জনসাধারণ আমি আজ—চিরকাল;—আমার হৃদয়ে
পৃথিবীর দণ্ডীদের মতো পরিমিত ভাষা নেই।
রাত্রিবেলা বহুক্ষণ মোমের আলোর দিকে চেয়ে,
তারপর ভোরবেলা যদি আমি হাত পেতে দিই
সূর্যের আলোর দিকে,—তবুও আমার সেই একটি ভাবনা
অতীব সহজ ভাষা খুঁজে নিতে গিয়ে
হৃদয়ঙ্গম করে সব আড়ষ্ট, কঠিন দেবতারা
অপরূপ মদ খেয়ে মুখ মুছে নিয়ে
পুনরায় তুলে নেয় অপূর্ব গেলাস;
উত্তেজিত না হয়েই অনায়াসে বলে যায় তারা:
হেমন্তের ক্ষেতে কবে হলুদ ফসল ফলেছিল,
অথবা কোথায় কালো হ্রদ ঘিরে ফুটে আছে সবুজ সিঙাড়া।
রক্তাতিপাতের দেশে বসেও তাদের সেই প্রাঞ্জলতায়
দেখে যাই সেই সোনালি ফসল হ্রদ, সিঙাড়ার ছবি;
আমার প্রেমিক সেই জলের কিনারে ঘাসে—দক্ষ প্রজাপতি;
মানুষ—ও—ছাগমুণ্ড কেটে তাকে শুদ্ধ করে দিয়ে যাবে অনাগত সবই,
একদিন হয়তো বা;—আজ সব উত্তমর্ণ দেবতাকে আমার হৃদয়
যে সব পবিত্র মদ দিয়েছিল—যে সব মদির
আলোর রঙের মতো ম্লান মদ দিয়ে গিয়েছিল,—
যখনি চুমুক দিই হয়ে থাকি চর্মচক্ষুস্থির!

ক্ষেতে—প্রান্তরে

১

ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস করে জীব
অবশেষে একদিন দেখেছে দু'তিন ধনু দূরে
কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই, চাষা
বলদের নিঃশব্দতা ক্ষেতের দুপুরে।
বাংলার প্রান্তরের অপরাহ্ণ এসে
নদীর খাড়িতে মিশে ধীরে
বেবিলন লণ্ডনের জন্ম, মৃত্যু হলে—
তবুও রয়েছে পিছু ফিরে।
বিকেল এমন বলে একটি কামিন এইখানে
দেখা দিতে এল তার কামিনীর কাছে;—
মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর
এক মাইল রৌদ্রে পড়ে আছে।

২

আবার বিকেলবেলা নিভে যায় নদীর খাড়িতে;
একটি কৃষক শুধু ক্ষেতের ভিতরে
তার বলদের সাথে সারাদিন কাজ করে গেছে;
শতাব্দী তীক্ষ্ণ হয়ে পড়ে।
সমস্ত গাছের দীর্ঘ ছায়া
বাংলার প্রান্তরে পড়েছে;
এ দিকের দিনমান—এ যুগের মতো শেষ হয়ে গেছে,
না জেনে কৃষক চোত—বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে পড়ে
চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল;

উনিশশো বেয়াল্লিশ বলে মনে হয়
তবুও কি উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল৷

৩

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই;
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিল ক্ষেতে;
সূর্যাস্তের সাথে চলে গেছে৷
সূর্য উঠবে জেনে স্থির হয়ে ঘুমায়ে রয়েছে৷
আজ রাতে শিশিরের জল
প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে খেলা করে;
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙ্গল,
ফালে—ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি,
পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ
সারাদিন অন্তহীন কাজ করে, নিরুৎকীর্ণ মাঠে
পড়ে আছে সৎ কি অসৎ?

৪

অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হয়ে তারপর জীব
এইখানে তবুও পায়নি কোনো ত্রাণ;
বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী অসমান৷
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই৷
কেবল খড়ের স্তূপ পড়ে আছে দুই—তিন মাইল,
তবু তা সোনার মতো নয়;
কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়৷

আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
জলপিপি চলে গেলে বিকেলের নদী কান পেতে
নিজের জলের সুর শোনে;
জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে—
ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে?
চৈত্য, ক্রুশ্, নাইন্টি—থ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি—প্রতিশ্রুতি
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরের প্রাণ
চিনে—চিনে হয়তো বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে
প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান
হয়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।

নিরুক্ত। আষাঢ় ১৩৪৯

বিভিন্ন কোরাস

১

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থাকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান;
এ রকম একদিন মনে হয়েছিল;—
অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর ঘনায়েছে আজ;
আমাদের উঁচু—নিচু দেয়ালের ভিতরে খোঁড়লে
ততোধিক গুনাগার আপনার কাজ
করে যায়;—ঘরের ভিতর থেকে খসে গিয়ে সন্ততির মন
বিভীষণ, নৃসিংহের আবেদন পরিপাক করে
ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চলে যায়,
রাতকে উপেক্ষা করে পুনরায় ভোরে
ভিরে আসে;—তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নেই,
যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ
ঢের আগে একদিন;—গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান
রুয়ে গেছি একদিন;—অন্য সব জিনিস হারায়ে,
সমস্ত চিন্তার দেশ ঘুরে তবু তাহাদের মন
অলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে অধিকার করে
কোথাও সম্মুখে পথ, পশ্চাদ্‌গমন
হারায়েছে—উতরোল নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি;—কাজ করে চলে গেছি অর্থভোগ করে;

ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।
গ্রন্থকে বিশ্বাস করে পড়ে গেছি;
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে করে নিয়ে ঢের পাপ করে, পাপকথা উচ্চারণ করে,
তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা
হারাইনি;—তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে—মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই—পথ নেই বলে,
যথাস্থান থেকে খসে তবুও সকলই যথাস্থানে
রয়ে যায়;—শতাব্দীর শেষ হলে এ রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে;—বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে:
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।

২

নিকটে মরুর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে:
যতদূর চোখ যায়—অনুভব করি;
তবু তাকে সমুদ্রের তিতীর্ষু আলোর মতো মনে করে নিয়ে
আমাদের জানালায় অনেক মানুষ,
চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে।
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের সুর শোনে তারা,
ভীত মুখশ্রীর সাথে এ—রকম অনন্য বিস্ময়
মিশে আছে;—তাহারা অনেক কাল আমাদের দেশে

ঘুরে—ফিরে বেরিয়েছে শারীরিক জিনিসের মতো;
পুরুষের পরাজয় দেখে গেছে বাস্তব দৈবের সাথে রণে;
হয়তো বস্তুর বল জিতে গেছে প্রজ্ঞাবশত;
হয়তো বা দৈবের অজেয় ক্ষমতা—
নিজের ক্ষমতা তার এত বেশি বলে
শুনে গেছে ঢের দিন আমাদের মুখের ভণিতা;
তবুও বক্তৃতা শেষ হয়ে যায় বেশি করতালি শুরু হলে।
এরা তাহা জানে সব।
আমাদের অন্ধকারে পরিত্যক্ত ক্ষেতের ফসল
ঝাড়ে—গোছে অপরূপ হয়ে ওঠে তবু
বিচিত্র ছবির মায়াবল।
ঢের দূরে নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অবিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে—রাত্রে ঘুমায়
পরিচিত স্মৃতির মতন।
সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে;
ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শময়
আক্ষেপে প্রস্তুত হয়ে অর্ধনারীশ্বর
তরাইয়ের থেকে লুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
সুকুমার ছায়া ফেলে সূর্যিমামার
নাবিকের লিবিডোকে উদ্বোধিত করে।

৩

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস,
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে করে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত হয়ে উঠে নদী

দেখা দেয় বিকেল অবধি,
অসংখ্য সূর্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে দেখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা
পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আঁধারের খাত বেয়ে;
ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে;
নদীর চেয়েও বেশি উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, উৎক্রান্ত পুরুষের হাল;
কামানের ঊর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে—
মেঘের ফোঁটার মতো স্বচ্ছ, গড়ানে;
সুবাতাস কেটে তারা পালকের পাখি তবু;
ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পারুলে
ইস্পাতের সূচীমুখ ফুটে ওঠে ওদের কাঁধের ’পরে, নীলিমার তলে;
অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে?
রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?
মহাসাগরের জল কখনও কি সৎবিজ্ঞাতার মতো হয়েছিল স্থির—
নিজের জলের ফেনশির
নীড়কে কি চিনেছিল তনুবাত নীলিমার নিচে?
না হলে উচ্ছল সিন্ধু মিছে?
তবুও মিথ্যা নয়: সাগরের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময়সুখ্যাত গুণে অন্ধ হয়ে, পরে আলোকিত হয়ে গেলে।

কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৯

স্বভাব

যদিও আমার চোখে ঢের নদী ছিল একদিন
পুনরায় আমাদের দেশে ভোর হলে,
তবুও একটি নদী দেখা যেত শুধু তারপর;
কেবল একটি নারী কুয়াশা ফুরোলে
নদীর রেখার পার লক্ষ্য করে চলে।
সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে
মানুষের শরীরের স্থিরতর মর্যাদার মতো
তার সেই মূর্তি এসে পড়ে।
সূর্যের সম্পূর্ণ বড়ো বিভোর পরিধি
যেন তার নিজের জিনিস।
এতদিন পরে সেই সব ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ
তাহলে সে স্মৃতি দেবে সহিষ্ণু আলোয়
দু—একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে;
যদিও লক্ষ লোক পৃথিবীতে আজ
আচ্ছন্ন মাছির মতো মরে—
তবুও একটি নারী 'ভোরের নদীর
জলের ভিতরে জল চিরদিন সূর্যের আলোয় গড়াবে'
এ—রকম দু—চারটে ভয়াবহ স্বাভাবিক কথা
ভেবে শেষ হয়ে গেছে একদিন সাধারণভাবে।

কবিতা। আষাঢ় ১৩৪৯

প্রতীতি

বাতাবিলেবুর পাতা উড়ে যায় হাওয়ায়—প্রান্তরে,—
শার্সিতে ধীরে—ধীরে জলতরঙ্গের শব্দ বাজে;
একমুঠো উড়ন্ত ধুলোয় আজ সময়ের আস্ফোট রয়েছে;
না হলে কিছুই নেই লবেজান লড়ায়ে জাহাজে।

বাইরে রৌদ্রের ঋতু বছরের মতো আজ ফুরায়ে গিয়েছে;
হোক না তা; প্রকৃতি নিজের মনোভাব নিয়ে অতীব প্রবীণ;
হিসেবে বিষণ্ণ সত্য রয়ে গেছে তার;
এবং নির্মল ভিটামিন।

সময় উচ্ছিন্ন হয়ে কেটে গেলে আমাদের পুরানো গ্রহে
জীবনস্পন্দন তার রূপ নিতে দেরি করে ফেলে,—
জেনে নিয়ে যে যাহার স্বজনের কাজ করে না কি—
পরার্থের কথা ভেবে ভালো লেগে গেলে।

মানুষেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতার সুর পৃথিবী ঘুরায়;
মাটির তরঙ্গ তার দু—পায়ের নিচে
অধোমুখে ধসে যায়—চারিদিকে কামাতুর ব্যক্তিরা বলে:
এ রকম রিপু চরিতার্থ করে বেঁচে থাকা মিছে।

কোথাও নবীন আশা রয়ে গেছে ভেবে
নীলিমার অনুকল্পে আজ যারা সয়েছে বিমান,—
কোনো এক তনুবাত শিখরের প্রশান্তির পথে

মানুষের ভবিষ্যৎ নেই—এই জ্ঞান

পেয়ে গেছে;—চারিদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন নেশন পড়ে আছে:
সময় কাটায়ে গেছে মোহ ঘোচাবার
আশা নিয়ে মঞ্জুভাষা, দোরিয়ান গ্রীস,
চীনের দেয়াল, পীঠ, পেপিরাস, কারারা—পেপার।

তাহারা মরেনি তবু;—ফেনশীর্ষ সাগরের ডুবুরির মতো
চোখ বুজে অন্ধকার থেকে কথা—কাহিনীর দেশে উঠে আসে;
যত যুগ কেটে যায় চেয়ে দেখে সাগরের নীল মরুভূমি
মিশে আছে নীলিমার সীমাহীন ভ্রান্তিবিলাসে।

ক্ষতবিক্ষত জীব মর্মস্পর্শে এলে গেলে—তবুও হেঁয়ালি;
অবশেষে মানবের স্বাভাবিক সূর্যালোকে গিয়ে
উত্তীর্ণ হয়েছে ভেবে—উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল
‘তেতাল্লিশ’ পঞ্চাশের দিগন্তরে পড়েছে বিছিয়ে

মাটির নিঃশেষ সত্য দিয়ে গড়া হয়েছিল মানুষের শরীরের ধুলো:
তবুও হৃদয় তার অধিক গভীরভাবে হতে চায় সৎ;
ভাষা তার জ্ঞান চায়, জ্ঞান তার প্রেম,—ঢের সমুদ্রের বালি
পাতালের কালি ঝেড়ে হয়ে পড়ে বিষণ্ণ, মহৎ।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৪৯

ভাষিত

আমার এ জীবনের ভোরবেলা থেকে—
সে—সব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার;
একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল
আমাদের দু—জনার মতো দাঁড়াবার

তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে
আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই।
একদিন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাথে পথ ধরে
ফিরে এসে বাংলার পথে দাঁড়াতেই

দেখা গেল পথ আছে,—ভোরবেলা ছড়ায়ে রয়েছে,—
দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, উত্তরের দিক
একটি কৃষাণ এসে বার—বার আমাকে চেনায়;
আমার হৃদয় তবু অস্বাভাবিক।

পরিচয় নেই তার,—পরিচিত হয় না কখনো;
রবিফসলের দেশে রৌদ্রের ভিতরে
মনে হয় সুচেতনা, তোমারও হৃদয়ে
ভুল এসে সত্যকে অনুভব করে।

সময়ের নিরুৎসুক জিনিসের মতো—
আমার নিকট থেকে আজও বিংশ শতাব্দীতে তোমাকে ছাড়ায়ে
ডান পথ খুলে দিল বলে মনে হল,
যখন প্রচুরভাবে চলে গেছি বাঁয়ে।

এ—রকম কেন হয়ে গেল তবে সব
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে।
একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে?

সমস্ত সকালবেলা এই কথা ভেবে পথ চলে
যখন পথের রেখা নগরীতে—দুপুরের শেষে
আমাকে উঠায়ে দিয়ে মৈথুনকালের সব সাপেদের মতো
মিশে গেল পরস্পরের কায়ক্লেশে,

তাকাতেই উঁচু—নিচু দেয়ালের অন্তরঙ্গ দেশ দেখা গেল;
কারু তরে সর্বদাই ভীত হয়ে আছে এক তিল;—
এ—রকম মনে হল বিদ্যুতের মতন সহসা;
সাগর—সাগর সে কি—অথবা কপিল?

এ—রকম অনুভব আমাকে ধারণ করে চুপে
স্থির করে রেখে গেল পথের কিনারে;
আকাশ নিজের স্থানে নেই মনে হল;

আকাশকুসুম তবু ফুটেছে পাপড়ি অনুসারে।

তবুও পৃথিবী নিজে অভিভূত বলে
ইহাদেরও নেই কোনো ত্রাণ:
সকলই মহৎ হতে চেয়ে শুধু সুবিধা হতেছে;
সকলই সুবিধা হতে গিয়ে তবু প্রধূমায়মান।

বিতর্ক আমার মতো মানুষের তরে নয় তবু;
আবেগ কি ক্রমেই আরেক তিল বিশোধিত হয়?
নিপ্পন ভীষণ লিপি লিখে দিল সূর্যদেবীকে;
সৌরকরময় চীন, রুশের হৃদয়।

চতুরঙ্গ। আশ্বিন ১৩৪৯

সৃষ্টির তীরে

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়—তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে:
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে:
সচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর
বিলোচন গিয়েছিল বিবাহ—ব্যাপারে;
প্রেমিকারা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে;
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল।
সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওংকার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়।
এ বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরনময়!
যুগে—যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।
কুইস্‌লিং বানাল কি নিজ নাম—হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল:
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল;
পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।
এ কেমন পরিবেশে রয়ে গেছি সবে—
বাক্‌পতি জন্ম নিয়েছিল যেই কালে,
অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিল স্বাভাবিকভাবে পথ দিয়ে,
কী করে তাহলে তারা এ রকম ফিচেল পাতালে
হৃদয়ের জন—পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে?

অথবা যে—সব লোক নিজের সুনাম ভালোবেসে
দুয়ার ও পরচুলা না এঁটে জানে না কোনো লীলা,
অথবা যে—সব নাম ভালো লেগে গিয়েছিল: আপিলা চাপিলা;
—রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেড্‌বাস্কেট খেল শেষে।
এরা সব নিজেদের গণিকা, দালাল, রেস্ত, শত্রুর খোঁজে
সাত—পাঁচ ভেবে সনির্বন্ধতায় নেমে আসে;
যদি বলি, তারা সব তোমাদের চেয়ে ভালো আছে;
অসৎপাত্রের কাছে তবে তারা অন্ধ বিশ্বাসে
কথা বলেছিল বলে দুই হাত সতর্কে গুটায়ে
হয়ে ওঠে কী যে উচাটন!—
কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন:
তাজা ন্যাক্‌ড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে।
ঘরের ভিতর কেউ খোয়ারি ভাঙছে বলে কপাটের জং
নিরস্ত হয় না তার নিজের ক্ষয়ের ব্যবসায়ে,
আগাগোড়া গৃহকেই চৌচির করেছে বরং;
অরেঞ্জপিকোর ঘ্রাণ নরকের সরায়ের চায়ে
ক্রমেই অধিক ফিকে হয়ে আসে; নানারূপ জ্যামিতিক টানের ভিতরে
স্বর্গ মর্ত পাতালের কুয়াশায় মতন মিলনে
একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে;—
অথবা তা ছায়া নয়—জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের ’পরে।
আপাদমস্তক আমি তার দিকে তাকায়ে রয়েছি;
গগ্যাঁর ছবির মতো—তবু গগ্যাঁর চেয়ে গুরু হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাকচোখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে—টায়ে:
নিভে যায়—জ্বলে ওঠে, ছায়া, ছাই, দিব্যযোনি মনে হয় তাকে।
স্বাতীতারা শুকতারা সূর্যের ইস্কুল খুলে
সে মানুষ নরক বা মর্তে বাহাল

হতে গিয়ে বৃষ ও মেষ বৃশ্চিক সিংহের প্রাতঃকাল
ভালোবেসে নিতে যায় কন্যা মীন মিথুনের কূলে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩০৫

জুহু

সান্টাক্রুজ্ থেকে নেমে অপরাহ্ণে জুহুর সমুদ্রপারে গিয়ে
কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষা করেছিল সূর্যের নিকটে থেমে সোমেন পালিত;
বাংলার থেকে এত দূরে এসে—সমাজ, দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান হারিয়ে,
প্রেমকেও যৌবনের কামাখ্যার দিকে ফেলে পশ্চিমের সমুদ্রের তীরে
ভেবেছিল বালির উপর দিয়ে সাগরের লঘুচোখ কাঁকড়ার মতন শরীরে
ধবল বাতাস খাবে সারাদিন;—যেইখানে দিন গিয়ে বৎসরে গড়ায়—
বছর আয়ুর দিকে—নিকেল—ঘড়ির থেকে সূর্যের ঘড়ির কিনারায়
মিশে যায়—সেখানে শরীর তার নটকান—রক্তিম রৌদ্রের আড়ালে
অরেঞ্জস্কোয়াস খাবে হয়তো বা, বোম্বায়ের 'টাইম্‌স্'টাকে বাতাসের বেলুনে উড়িয়ে,
বর্তুল মাথায় সূর্য বালি ফেনা অবসর অরুণিমা ঢেলে,
হাতির হাওয়ার লুপ্ত কয়েতের মতো দেবে নিমেষে ফুরিয়ে
চিন্তার বুদ্‌বুদ্‌দের! পিঠের ওপার থেকে তবু এক আশ্চর্য সংগত
দেখা দিল। ঢেউ নয়, বালি নয়, উনপঞ্চাশ বায়ু, সূর্য নয় কিছু—
সেই রলরোলে তিন—চার ধনু দূরে—দূরে এয়ারোড্রামের কলরব
লক্ষ্য পেল অচিরেই—কৌতূহলে হৃষ্ট সব সুর
দাঁড়াল তাহাকে ঘিরে বৃষ মেষ বৃশ্চিকের মতন প্রচুর;
সকলেরই ঝিঁক চোখে—কাঁধের উপরে মাথা—পিছু
কোথাও দ্বিরুক্তি নেই মাথার ব্যথার কথা ভেবে।
নিজের মনের ভুলে কখন সে কলমকে খড়গের চেয়ে
ব্যাপ্ত মনে করে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা, বই, সকলকে সম্বোধন করে!

কখন সে বজেট—মিটিং, নারী, পার্টি—পলিটিক্স, মাংস, মার্মালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল!—
টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পার্শী, মেম, খোজা, বেদূইন, সমুদ্রের তীর,
জুহু, সূর্য, ফেনা, বালি—সান্টাক্রুজে সবচেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর?—যেন তার দুই গালে নিরুপম দাড়ির ভিতরে
দুটো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার করে তবু ঘরে
বসে আছে;—মুন্সী, সাভারকর, নরীম্যান তিন দৃষ্টিকোণ থেকে নেমে এসে
দেখে গেল, মহিলারা মর্মরের মতো স্বচ্ছ কৌতূহলভরে,
অব্যয় শিল্পীরা সব: মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে।

বৈশাখ ২। ১৩৫০

সোনালি সিংহের গল্প

আমাদের পরিজন নিজেদের চিনেছিল না কি?
এই সেই সংকল্পের পিছে ফিরে হেমন্তের বেলাবেলি দিন
নির্দোষ আমোদে সাঙ্গ করে ফেলে চায়ের ভিতরে;
চায়ের অসংখ্য ক্যান্টিন।
আমাদের উত্তমর্ণদের কাছে প্রতিজ্ঞার শর্ত চেয়ে তবু
তাহাদের খুঁজে পাই ছিমছাম,—কনুয়ের ভরে
বসে আছে প্রদেশের দূর বিসারিত সব ক্ষমতার লোভে।
কোথায় প্রেমিক তুমি: দীপ্তির ভিতরে!
কোথাও সময় নেই আমাদের ঘড়ির আঁধারে।
আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ রূপসীর মতো বিচক্ষণ,
যে—কোনো রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে;
যে—কোনো ত্বরান্বিত উৎসাহের তরে;
পৃথিবীর বারগৃহ ধরে তারা উঠে যেতে চায়।
নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমাদের ক্ষেতে—ভুঁয়ে অবিরাম হতমান সোনা
ফলে আছে বলে মনে হয়;
আমাদের হৃদয়ের সাথে
সে সব ধানের আন্তরিক পরিচয়

নেই; তবু এইসব ফসলের দেশে
সূর্য নিরন্তর হিরণ্ময়;
আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস
মিড্‌ল্‌ম্যানদের কাছে পর নয়।
তাহারা চেনায়ে দেয় আমাদের ঘিঞ্জি ভাঁড়ার,
আমাদের জরাজীর্ণ ডাক্তারের মুখ,
আমাদের উকিলের অনুপ্রাণনাকে,
আমাদের গড়পড়তার সব পড়তি কৌতুক
তাহারা বেহাত করে ফেলে সব।
রাজপথে থেকে—থেকে মূঢ় নিঃশব্দতা
বেড়ে ওঠে;—অকারণে এর—ওর মৃত্যু হয়ে গেলে—
অনুভব করে তবু বলবার মতো কোনো কথা
নেই। বিকেলে গা ঘেঁষে সব নিরুত্তেজ সরজমিনে বসে
বেহেড আত্মার মতো সূর্যাস্তের পানে
চেয়ে থেকে নিভে যায় এক পৃথিবীর
প্রক্ষিপ্ত রাত্রির লোকসানে।
তবুও ভোরের বেলা বার—বার ইতিহাসে সঞ্চারিত হয়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে—
যদি না সূর্যাস্তের ফের হয়ে যায় সোনালি হেঁয়ালি।

অনুসূর্যের গান

কোনো এক বিপদের গভীর বিস্ময়
আমাদের ডাকে।
পিছে—পিছে ঢের লোক আসে।
আমরা সবের সাথে ভিড়ে চাপা পড়ে—তবু—
বেঁচে নিতে গিয়ে
জেনে বা না—জেনে ঢের জনতাকে পিষে—ভিড় করে,
করুণার ছোট—বড়ো উপকণ্ঠে—সাহসিক নগরে—বন্দরে
সর্বদাই কোনো—এক সমুদ্রের দিকে
সাগরের প্রয়াণে চলেছি।
সে সমুদ্র—
জীবন বা মরণের;
হয়তো বা আশার দহনে উদ্বেল।
যারা বড়ো, মহীয়ান—কোনো—এক উৎকণ্ঠার পথে
তবু স্থির হয়ে চলে গেছে;
একদিন নচিকেতা বলে মনে হতো তাহাদের;
একদিন আত্তিলার মতো তবু;
আজ তারা জনতার মতো।
জীবনের অবিরাম বিশৃঙ্খলা স্থির করে দিতে গিয়ে তবু
সময়ের অনিবার উদ্ভাবনা এসে
যে সব শিশুকে যুবা—প্রবীণ করেছে তারপর,

তাদের চোখের আলো
অনাদির উত্তরাধিকার থেকে, নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে
তাদের প্রায়ান্ধ চোখে আজ রাতে লেন্‌স্‌,
চেয়ে দেখে চারিদিকে অগণন মৃতদের চোক্ষের ফস্‌ফোরেসেন্‌স্‌।

তাদের সম্মুখে আলো
দীনাত্মা তারার
জ্যোৎস্নার মতন।

জীবনের শুভ অর্থ ভালো করে জীবনধারণ
অনুভব করে তবু তাহাদের কেউ—কেউ আজ রাতে যদি
অই জীবনের সব নিঃশেষ সীমা
সমুজ্জ্বল, স্বাভাবিক হয়ে যাবে মনে ভেবে—
স্মরণীয় অঙ্কে কথা বলে,
তাহলে সে কবিতা কালিমা
মনে হবে আজ?
আজকে সমাজ
সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
তিমিরবিদারী অনুসূর্যের কাজ।

পূর্বাশা। কার্তিক ১৩৪০

তিমিরহননের গান

কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো—এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরের সাথে দু—দণ্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন—
হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিল।
অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরে তারার আলোক।
সেই জের টেনে আজও খেলি।
সূর্যালোক নেই—তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হলে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হয়ে ভদ্রসাধারণ
চেয়ে দেখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরও বেশি কালো—কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসাব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে

নর্দমায় নেমে—
ফুটপাথ থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাথে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।
এরা সব এই পথে;
ওরা সব ওই পথে—তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই,—তবু এই জের টেনে খেলি;
সূর্যালোকে প্রজ্ঞাময় মনে হলে হাসি;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে—অন্ধকারে—
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

কবিতা। পৌষ ১৩৫০

বিস্ময়

কোথাও নতুন দিন রয়ে গেছে না কি।
উঠে বসে সকলের সাথে কথা বলে
সমিতির কোলাহলে মিশে
তবুও হিসেব দিতে হয় এসে কোনো—এক স্থানে;
—সেখানে উটের পিঠে সার্থবাহ দিগন্তরে মিলিয়ে গিয়েছে;
সাইরেনের কথা স্থির;
আর শেষ সাগরে জাহাজডুবি জীবনে মিটেছে;
বন্দরের অধিকারীদের হাল, কৃচ্ছ্র, আলোড়ন,
মানুষের মরণের ভয়ের ক্ষয়ের জন্যে মানুষের সর্বস্বসাধন
হতে চায়,—হয়তো বা হয়ে গেছে সার্বজনীন কল্যাণ।

জানি এ—রকম দিন আজও আসেনিকো।
এ—রকম যুগ ঢের—হয়তো বা আরও ঢের দূরের জিনিস।
আজ, এই ভূমিকায় মুহূর্তের বিস্মৃতির, স্মৃতির ভিতরে
সারাদিন সকলের সাথে ব্যবহৃত হয়ে চলি,
জিতে হেরে লুকায়ে সন্ধান ভুলে; নিরুদ্দিষ্ট ভয়
খামিরের মতো এসে আমাদের সবের হৃদয়
অধিকার করে রাখে।

চারিদিকে সরবরাহের সুর সারাদিনমান
কী চাহিদা কাদের মেটায়।
মানুষের জন্যে মানুষের সব সম্ভ্রমের ভাষা, ভাঙাগড়া, ভালোবাসা
এতদিন পরে এই অন্ধ পরিণতির মতন
হয়ে গিয়ে তবুও কঠিন ক্রান্তি না কি?

কোলাহলে ভিড়ে গেছে জনসাধারণ;
জীবনের রক্তের বিনিময়ে ফাঁকি
প্রাণ ভরে তুলে নিয়ে পরস্পরের দাবি হিংসা প্রেম ঊর্ণাকঙ্কালে মিলে গিয়ে
তবুও যে যার নিজ অন্ধ কাঠামোর কাছে ঠেকে—অহরহ—
সময়ের অনাবিষ্কৃত অন্তরীপ।

মনে হয় কোনো—এক সমুদ্রের মাইলের—মাইলের দূর দিগন্তর
উদ্বেল, নিরপরাধভাবে
জীবনের মতো নীল হয়ে, তবু—মৃত্যুর মতন প্রভাবে।
অন্ধকার ঝড় থেকে অঙ্কে অগণন মেরুপাহাড়ের পাখি
সে তার নিজের বুকে টেনে নিয়ে—
অই পারে নব বসন্তের দেশে খুলে দিতে চেয়েছিল না কি?
সনাতন সত্যে অন্ধ হয়ে তবু—মিথ্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে
পাখিদের ডেকে নিয়ে উড়ায়ে দিতেছে;

মৃত্তিকার মর্মে ম্লান অম্লান উপকূলে হয়তো বা—আর—একবার তবু ওড়াবার মতো;
মরণ বা প্রলোভন উপচায়ে—জীবনের নির্দেশবশত।

পূর্বাশা। চৈত্র ১৩৫০

সৌরকরোজ্জ্বল

পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ;
যে—কোনো পথের বাঁকে ভাঙনের নদীর শিয়রে
তাদের সমাজ।
তবুও তাদের ধারা—ধর্ম অর্থ কাম কলরব কুশীলব—
কিংবা এ—সব থেকে আসন্ন বিপ্লব
ঘনায়ে—ফসল ফলায়ে—তবু যুগে—যুগে উড়ায়ে গিয়েছে পঙ্গপাল।
কাল তবু—হয়তো আগামী কাল।
তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে; তৃতীয় চতুর্থ—আরও সব
আন্তর্জাতিক গড়ে ভেঙে গড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব।

সূর্যতামসী

কোথাও পাখির শব্দ শুনি;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর;
কোথাও ভোরের বেলা রয়ে গেছে—তবে।
অগণন মানুষের মৃত্যু হলে—অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে;
এ কোন্ সিন্ধুর সুর:
মরণের—জীবনের?
এ কি ভোর?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।
একটি রাত্রির ব্যথা সয়ে—
সময় কি অবশেষে এ—রকম ভোরবেলা হয়ে
আগামী রাতের কালপুরুষের শস্য বুকে করে জেগে ওঠে।
কোথাও ডানার শব্দ শুনি;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর—
দক্ষিণের দিকে,
উত্তরের দিকে,
পশ্চিমের পানে।
সৃজনের ভয়াবহ মানে—
তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে
সূর্যালোকিত সব সিন্ধুপাখিদের শব্দ শুনি;
ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রিকরোজ্জ্বল
ভিয়েনা, টোকিয়ো, রোম, মিউনিখ—তুমি?
সার্থবাহ, সার্থবাহ, ওই দিকে নীল
সমুদ্রের পরিবর্তে আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি!

বিলীন হয় না মায়ামৃগ—নিত্য দিকদর্শিন্;
অনুভব করে নিয়ে মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস
যা জেনেছে—যা শেখেনি—
সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মতো জ্বলে
জাগে না কি হে জীবন—হে সাগর—
শকুন্ত—ক্রান্তির কলরোলে৷

রাত্রির কোরাস

এখন সে কত রাত;
এখন অনেক লোক দেশ—মহাদেশের সব নগরীর গুঞ্জরন হতে
ঘুমের ভিতরে গিয়ে ছুটি চায়।
পরস্পরের পাশে নগরীর ঘ্রাণের মতন
নগরী ছড়ায়ে আছে।
কোনো ঘুম নিঃসাড় মৃত্যুর নামান্তর।
অনেকেরই ঘুম
জেগে থাকা।
নগরীর রাত্রি কোনো হৃদয়ের প্রেয়সীর মতো হতে গিয়ে
নটীরও মতন তবু নয়;—
প্রেম নেই—প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে;
উঠে ভেঙে গেছে।
কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।
ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র প্রাণের প্রয়াস রয়ে গেছে;
তুচ্ছ নদী—সমুদ্রের চোরাগলি ঘিরে
রয়ে গেছে মাইন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, অনন্ত কন্‌ভয়,—
মানবকদের ক্লান্ত সাঁকো;
এর চেয়ে মহীয়ান আজ কিছু নেই জেনে নিয়ে
আমাদের প্রাণের উত্তরণ আসেনাকো।
সূর্য অনেক দিন জ্বলে গেছে মিশরের মতো নীলিমায়।
নক্ষত্র অনেক দিন জেগে গেছে চীন, কুরুবর্ষের আকাশে।
তারপর ঢের যুগ কেটে গেলে পর
পরস্পরের কাছে মানুষ সফল হতে গিয়ে এক অস্পষ্ট রাত্রির
অন্তর্যামী যাত্রীদের মতো

জীবনের মানে বার করে তবু জীবনের নিকটে ব্যাহত
হয়ে আরও চেতনার ব্যথায় চলেছে।
মাঝে—মাঝে থেমে চেয়ে দেখে
মাটির উপর থেকে মানুষের আকাশে প্রয়াণ
হল তাই মানুষের ইতিহাসবিবর্ণ হৃদয়
নগরে—নগরে গ্রামে নিষ্প্রদীপ হয়।
হেমন্তের রাতের আকাশে আজ কোনো তারা নেই।
নগরীর—পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
তবুও কেবলই ভেঙে যায়
স্প্লিন্টারের অনন্ত নক্ষত্রে।
পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ;
পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা;
ইয়াঙ্কির লেন—দেন ডলারে প্রত্যয়;—
এই সব মৃত হাত তবে
নব—নব ইতিহাস—উন্মেষের না কি?—
ভেবে কারু রক্তে স্থির প্রীতি নেই—নেই;—
অগণন তাপী সাধারণ প্রাচী অবাচীর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই—কোথাও দিৎসা নেই—জেনে
তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।

আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয় ১৩৫১

নাবিকী

হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে
এ—রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায়;
মাঠের ফসলগুলো বার—বার ঘরে
তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে।
মৃত্তিকার ওই দিক আকাশের মুখোমুখি যেন শাদা মেঘের প্রতিভা;
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক;
কিছু নেই—তবুও অপেক্ষাতুর;
হৃদয়স্পন্দন আছে—তাই অহরহ
বিপদের দিকে অগ্রসর;
পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মতন শহরে
কিছু চায়;
কী যে চায়।
যেন কেউ দেখেছিল খণ্ডাকাশ যতবার পরিপূর্ণ নীলিমা হয়েছে,
যতবার রাত্রির আকাশ ঘিরে স্মরণীয় নক্ষত্র এসেছে,
আর তাহাদের মতো নরনারী যতবার
তেমন জীবন চেয়েছিল,
যত নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে রৌদ্রের আকাশে,
নদীর ও নগরীর
মানুষের প্রতিশ্রুতির পথে যত
নিরুপম সূর্যালোক জ্বলে গেছে—তার
ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার।
মানবের অভিজ্ঞতা এ—রকম।

অভিজ্ঞতা বেশি ভালো হলে তবু ভয়
পেতে হত?
মৃত্যু তবে ব্যসনের মতো মনে হত?
এখন ব্যসন কিছু নেই।
সকলেই আজ এই বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির
সমুদ্রের যাত্রীর মতন
ভালো—ভালো নাবিক ও জাহাজের দিগন্তর খুঁজে
পৃথিবীর ভিন্ন—ভিন্ন নেশনের নিঃসহায় প্রতিভূর মতো
পরস্পরকে বলে, ‘হে নাবিক, হে নাবিক তুমি—
সমুদ্র এমন সাধু, নীল হয়ে—তবুও মহান মরুভূমি;
আমরাও কেউ নই—’
তাহাদের শ্রেণী যোনি ঋণ রক্ত রিরংসা ও ফাঁকি
উঁচুনিচু নরনারী নিক্তিনিরপেক্ষ হয়ে আজ
মানবের সমাজের মতন একাকী
নিবিড় নাবিক হলে ভালো হয়;
হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি।

বৈশাখী ৩। ১৩৫১

সময়ের কাছে

সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।
সেইসব একদিন হয়তো বা কোনো—এক সমুদ্রের পারে
আজকের পরিচিত কোনো নীল আভার পাহাড়ে
অন্ধকারে হাড়কঙ্করের মতো শুয়ে
নিজের আয়ুর দিন তবুও গণনা করে যায় চিরদিন;—
নীলিমার থেকে ঢের দূরে সরে গিয়ে,
সূর্যের আলোর থেকে অন্তর্হিত হয়ে;
পেপিরাসে—সেদিন প্রিন্টিং প্রেসে কিছু নেই আর;
প্রাচীন চীনের শেষে নবতম শতাব্দীর চীন
সেদিন হারিয়ে গেছে।

আজকে মানুষ আমি তবুও তো—সৃষ্টির হৃদয়ে
হৈমন্তিক স্পন্দনের পথে ফসল;
আর এই মানবের আগামী কঙ্কাল;
আর নব—
নব—নব মানবের তরে
কেবলই অপেক্ষাতুর হয়ে পথ চিনে নেওয়া—
চিনে নিতে চাওয়া;
আর সে—চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা;
(কেন এই ক্ষুধা—
কেনই সমাপ্তিহীন!)
যারা সব পেয়ে গেছে তাদের উচ্ছিষ্ট,
যারা কিছু পায় নাই তাদের জঞ্জাল;

আমি এই সব।

সময়ের সমুদ্রের পারে
কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে
সাগরের বড়ো শাদা পাখির মতন
দুইটি ছড়ানো ডানা বুক নিয়ে কেউ
কোথাও উচ্ছল প্রাণশিখা
জ্বালায়ে সাহস সাধ স্বপ্ন আছে—ভাবে।
ভেবে নিক—যৌবনের জীবন্ত প্রতীক: তার জয়!
প্রৌঢ়তার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স
অগ্রসর হয়ে কোন্ আলোকের পাখিকে দেখেছে?—
জয়, তার জয়, যুগে—যুগে তার জয়!—
ডোডো পাখি নয়।

মানুষেরা বারবার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
নব—নব ইতিহাস—সৈকতে ভিড়েছে;
তবুও কোথায় সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর?
নচিকেতা জরাথ্রুস্ট্র লাওৎ—সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলই গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে:
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন?
নব—নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন

অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে!
সেই সব সুনিবিড় উদ্‌বোধনে—‘আছে আছে আছে’ এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়;—
জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।

লোকসামান্য

অন্ধভাবে আলোকিত হয়েছিল তারা
জীবনের সাগরে—সাগরে:
বঙ্গোপসাগরে,
চীনের সমুদ্রে—দ্বীপপুঞ্জের সাগরে।
নিজের মৎসর নিয়ে নিশানের 'পরে সূর্য এঁকে
চোখ মেরেছিল তারা নীলিমার সূর্যের দিকে।
তারা সব আজ রাতে বিলোড়িত জাহাজের খোল
সাগরকীটের মৃত শরীরের আলেয়ার মতো
সময়ের দোলা খেয়ে নড়ে;
'এশিয়া কি এশিয়াবাসীর
কোপ্রস্‌পেরেটির
সূর্যদেবীর নিজ প্রতীতির তরে?'
বলে সে পুরোনো যুগ শেষ হয়ে যায়।
কোথাও নতুন দিন আসে;
কে জানে সেখানে সৎ নবীনতা রয়ে গেছে কিনা;
সূর্যের চেয়েও বেশি বালির উত্তাপে
বহুকাল কেটে গেছে বহুতর শ্লোগানের পাপে।
এ রকম ইতিহাসে উৎস রক্ত হয়ে
এই নব উত্তরাধিকারে
স্বর্গতি না হোক—তবু মানুষের চরিত্র সংহত হয় না কি?
ভাবনা ব্যাহত হয়ে বেড়ে যায়—স্থির হয় না কি?
হে সাগর সময়ের,
হে মানুষ,—সময়ের সাগরের নিরঞ্জন—ফাঁকি
চিনে নিয়ে বিমলিন নাবিকের মতন একাকী

হলেও সে হত, তবু পৃথিবী বড়ো রৌদ্রে—আরও প্রিয়তর জনতায়
‘নেই’ এই অনুভব জয় করে আনন্দে ছড়ায়ে যেতে চায়।

জনান্তিকে

তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি
আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।
কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখিরও মতন কোনো হৃদয়ের তরে!
পাখি নেই।
মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল বলে
আজ তার মানবকে কী করে চেনাতে পারে কেউ।
চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।
দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলই আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়;
এ ছাড়া নির্মল কোনো জননীতি নেই।
যে মানুষ—যেই দেশ টিকে থাকে সে—ই
ব্যক্তি হয়—রাজ্য গড়ে—সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলই ভেঙে গিয়ে
তারই পিপাসায়

গড়ে ওঠে।
এ ছাড়া অমল কোনো রাজনীতি পেতে হলে তবে
উজ্জ্বল সময়স্রোতে চলে যেতে হয়।
সেই স্রোত আজও এই শতাব্দীর তরে নয়।
সকলের তরে নয়।
পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে;
ঝরে পড়ে।

এইসব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুনে নিতে
ব্যাপ্ত হতে হয়।
নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।

চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনও ভোরের জনান্তিকে
চোখে থেকে যায়
আরও এক আভা:
আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর
হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস
হয়ে তুমি রয়ে গেছ।

তোমার মাথার চুলে কেবলই রাত্রের মতো চুল
তারকার অনটনে ব্যাপক বিপুল
রাতের মতন তার একটি নির্জন নক্ষত্রকে
ধরে আছে।

তোমার হৃদয়ে গায়ে আমাদের জনমানবিক
রাত্রি নেই। আমাদের প্রাণে এক তিল
বেশি রাত্রির মতো আমাদের মানবজীবন
প্রচারিত হয়ে গেছে বলে—
নারি,
সেই এক তিল কম।
আর্ত রাত্রি তুমি।

শুধু অন্তহীন ঢল, মানব—খচিত সাঁকো, শুধু অমানব নদীদের
অপর নারীর কণ্ঠ তোমার নারীর দেহ ঘিরে;
অতএব তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে
আমাদের আজকের পরিভাষা ছাড়া আরও নারী
আছে। আমাদের যুগের অতীত এক কাল
রয়ে গেছে।

নিজের নুড়ির 'পরে সারাদিন নদী
সূর্যের—সুরের বীথি, তবু
নিমেষে উপল নেই—জলও কোন্ অতীতে মরেছে;
তবু নবীন নুড়ি—নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী;
জানি আমি জানি আদিনারীশরীরিণীকে স্মৃতির
(আজকে হেমন্ত ভোরে) সে কবের আঁধার অবধি;—
সৃষ্টির ভীষণ অমা ক্ষমাহীনতায়
মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়

বকুলের বনে মনে অপার রক্তের ঢলে গ্লেশিয়ারে জলে
অসতী না হয়ে তবু স্মরণীয় অনন্ত উপলে
প্রিয়াকে পীড়ন করে কোথায় নভের দিকে চলো।

পূর্বাশা। কার্তিক ১৩৫২

মকরসংক্রান্তির রাতে

(আবহমান ইতিহাসচেতনা একটি পাখির মতো যেন)

কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে
নক্ষত্রের থেকে আরও নক্ষত্রের রাতে
আজকের পৃথিবীর আলোড়ন হৃদয়ে জাগিয়ে
আরও বড়ো বিষয়ের হাতে
সে সময় মুছে ফেলে দিয়ে
কী এক গভীর সুসময়!
মকর'ক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন:
—তবুও তা পৃথিবীর নয়;
এখন গভীর রাত, হে কালপুরুষ,
তবু পৃথিবীর মনে হয়।

শতাব্দীর যে—কোনো নটীর ঘরে
নীলিমার থেকে কিছু নিচে
বিশুদ্ধ মুহূর্ত তার মানুষীর ঘুমের মতন;
ঘুম ভালো,—মানুষ সে নিজে
ঘুমাবার মতন হৃদয়
হারিয়ে ফেলেছে তবু।
অবরুদ্ধ নগরী কি? বিচূর্ণ কি? বিজয়ী কি? এখন সময়

অনেক বিচিত্র রাত মানুষের ইতিহাসে শেষ করে তবু
রাতের স্বাদের মতো সপ্রতিভ বলে মনে হয়।
মানুষের মৃত্যু, ক্ষয়, প্রেম, বিপ্লবের ঢের নদীর নগরে
এই পাখি আর এই নক্ষত্রেরা ছিল মনে পড়ে।

মকর'ক্রান্তির রাতে গভীর বাতাস।
আকাশের প্রতিটি নক্ষত্র নিজ মুখ চেনাবার
মতন একান্ত ব্যাপ্ত আকাশকে পেয়ে গেছে আজ।
তেমনি জীবনপথে চলে যেতে হলে তবে আর
দ্বিধা নেই;—পৃথিবী ভঙ্গুর হয়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায়;
পৃথিবী প্রতিভা হয়ে আকাশের মতো এক শুভ্রতায় নেমে
নিজেকে মেলাতে গিয়ে বেবিলন লণ্ডন
দিল্লি কলকাতার নক্‌টার্নে
অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে: গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হয়ে যাবে না কি!—
সূর্যে, আরও নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি।

কবিতা। আশ্বিন ১৩৫২

উত্তরপ্রবেশ

পুরোনো সময় সুর ঢের কেটে গেল।

যদি বলা যেত:

সমুদ্রের পারে কেটে গেছে,

সোনার বলের মতো সূর্য ছিল পুবের আকাশে—

সেই পটভূমিকায় ঢের

ফেনশীর্ষ ঢেউ,

উড়ন্ত ফেনার মতো অগণন পাখি।

পুরোনো বছর দেশ ঢের কেটে গেল

রোদের ভিতরে ঘাসে শুয়ে;

পুকুরের জল থেকে কিশোরের মতো তৃপ্ত হাতে

ঠাণ্ডা পানিফল, জল ছিঁড়ে নিতে গিয়ে;

চোখের পলকে তবু যুবকের মতো

মৃগনাভিঘন বড়ো নগরের পথে

কোনো—এক সূর্যের জগতে

চোখের নিমেষ পড়েছিল।

সেইখানে সূর্য তবু অস্ত যায়।

পুনরুদয়ের ভোরে আসে

মানুষের হৃদয়ের অগোচর

গম্বুজের উপরে আকাশে।

এ ছাড়া দিনের কোনো সুর
নেই;
বসন্তের অন্য সাড়া নেই।
প্লেন আছে:
অগণন প্লেন
অগণ্য এয়ারোড্রোম
রয়ে গেছে।
চারিদিকে উঁচু—নিচু অন্তহীন নীড়—
হলেও বা হয়ে যেত পাখির মতন কাকলির
আনন্দে মুখর;

সেইখানে ক্লান্তি তবু—
ক্লান্তি—ক্লান্তি;
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময়;
সেইখানে মৃত্যু তবু;
এই শুধু—
এই;
চাঁদ আসে একলাটি;
নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে;
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম আবেগে
এসে তবু অস্ত যায়;
উদয়ের ভোরে ফিরে আসে

আপামর মানুষের হৃদয়ের অগোচর
রক্ত হেডলাইনের—রক্তের উপরে আকাশে।
এ ছাড়া পাখির কোনো সুর—
বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই।
নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হয়ে থাকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ করে আরও বড়ো চেতনার লোকে;
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়।

যুগান্তর। শারদীয় ১৩৫২

দীপ্তি

তোমার নিকট থেকে
যত দূর দেশে
আমি চলে যাই
তত ভালো।
সময় কেবলই নিজ নিয়মের মতো;—তবু কেউ
সময় স্রোতের ’পরে সাঁকো
বেঁধে দিতে চায়;
ভেঙে যায়;
যত ভাঙে তত ভালো।
যত স্রোত বয়ে যায়
সময়ের
সময়ের মতন নদীর
জলসিঁড়ি, নিপার, ওডার, রাইন, রেবা, কাবেরীর
তুমি তত বয়ে যাও,
আমি তত বয়ে চলি,
তবুও কেহই কারু নয়।

আমরা জীবন তবু।

তোমার জীবন নিয়ে তুমি
সূর্যের রশ্মির মতো অগণন চুলে
রৌদ্রের বেলার মতো শরীরের রঙে
খরতর নদী হয়ে গেলে
হয়ে যেতে৷
তবুও মানুষী হয়ে
পুরুষের সন্ধান পেয়েছ;
পুরুষের চেয়ে বড়ো জীবনের হয়তো বা৷

আমিও জীবন তবু;—
ক্বচিৎ তোমার কথা ভেবে
তোমার সে শরীরের থেকে ঢের দূরে চলে গিয়ে
কোথাও বিকেলবেলা নগরীর উৎসারণে উচল সিঁড়ির
উপরে রৌদ্রের রঙ জ্বলে ওঠে—দেখে
বুদ্ধের চেয়েও আরও দীন সুষমায় সুজাতার
মৃত বৎসকে বাঁচায়েছে
কেউ যেন;
মনে হয়,
দেখা যায়৷

কেউ নেই—স্তব্ধতায়; তবু হৃদয়ে দীপ্তি আছে৷

দিন শেষ হয়নি এখনও।
জীবনের দিন—কাজ—
শেষ হতে আজও ঢের দেরি।
অন্ন নেই। হৃদয়বিহীনভাবে আজ
মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর।
রক্তের সমুদ্র চারিদিকে;
কলকাতা থেকে দূর
গ্রীসের অলিভ—বন
অন্ধকার।

অগণন লোক মরে যায়;
এম্পিডোক্লেসের মৃত্যু নয়;—
সেই মৃত্যু ব্যসনের মতো মনে হয়।

এ—ছাড়া কোথাও কোনো পাখি
বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই।
তবু এক দীপ্তি রয়ে গেছে।

বৈশাখী ৪। ১৩৫২

সূর্যপ্রতিম

আমরণ কেবলই বিপন্ন হয়ে চলে
তারপর যে বিপদ আসে
জানি
হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস;
এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।
বালুচরে নদীটির জল ঝরে,
খেলে যায় সূর্যের ঝিলিক,
মাছরাঙা ঝিক্‌মিক্‌ করে উড়ে যায়;
মৃত্যু আর করুণার দুটো তরোয়াল আড়াআড়ি
গড়ে ভেঙে নিতে চায় এইসব সাঁকো ঘরবাড়ি;
নিজেদের নিশিত আকাশ ঘিরে থাকে।

এ—রকম হয়েছে অনেক দিন—রোদ্রে বাতাসে;
যারা সব দেখেছিল—
যারা ভালোবেসেছিল এইসব—তারা
সময়ের সুবিধায় নিলেমে বিকিয়ে গেছে আজ।
তারা নেই।

এসো আমরা যে যার কাছে—যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠি।

নব পৃথিবী পেতে সময় চলেছে?
হে অবাচী, হে উদীচী, কোথাও পাখির শব্দ শুনি;
কোথাও সূর্যের ভোর রয়ে গেছে বলে মনে হয়!
মরণকে নয় শুধু—
মরণসিন্ধুর দিকে অগ্রসর হয়ে
যা—কিছু দেখার আছে
আমরাও দেখে গেছি;
ভুলে গেছি, স্মরণে রেখেছি।
পৃথিবী বালি রক্ত কালিমার কাছে তারপর
আমরা খারিজ হয়ে দোটানার
অন্ধকারে তবুও তো
চক্ষুস্থির রেখে
গণিকাকে দেখায়েছি ফাঁদ;
প্রেমিককে শিখায়েছি ফাঁকির কৌশল।
শেখাইনি?

শতাব্দী আবেশে অস্তে চলে যায়:
বিপ্লবী কি স্বর্ণ জমায়।
আকণ্ঠ মরণে ডুবে চিরদিন
প্রেমিক কি উপভোগ করে যায়
স্নিগ্ধ সার্থবাহদের ঋণ।
তবে এই অলক্ষিতে কোন্‌খানে জীবনের আশ্বাস রয়েছে।

আমরা অপেক্ষাতুর;
চাঁদের ওঠার আগে কালো সাগরের
মাইলের পরে আরও অন্ধকার ডাইনি মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মতো
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় যোগান দিয়ে ভেসে
এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই,
উড়ে যেতে চাই।

পিছনের ঢেউগুলো প্রতারণা করে ভেসে গেছে;
সামনের অভিভূত অন্তহীন সমুদ্রের মতন এসেছে;
লবণাক্ত পালকের ডানায় কাতর
ঝাপ্‌টার মতো ভেঙে বিশ্বাসহন্তার মতো কেউ
সমুদ্রের অন্ধকার পথে পড়ে আছে।
মৃত্যু আজীবন অগণন হল, তবু
এ—রকমই হবে।

'কেবলই ব্যক্তির—ব্যক্তির মৃত্যু শেষ করে দিয়ে আজ
আমরাও মরে গেছি সব—'
দলিলে না মরে তবু এ রকম মৃত্যু অনুভব
করে তারা হৃদয়হীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস
সাঙ্গ করে দিতে চেয়ে যতদূর মানুষের প্রাণ
অতীতে ম্লানায়মান হয়ে গেছে সেই সীমা ঘিরে

জেগে ওঠে উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, অনন্তের

অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

চতুরঙ্গ। আশ্বিন ১৩৫১